Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 287
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 278 - 287
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

পুরুলিয়ার মুখোশ শিল্প ও ছৌ-নৃত্য : লোকসংস্কৃতির এক চিরনূতন ধারা

শতাব্দী ধন

Email ID: dhanshatabdi96@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Folk Culture, Mask, Chhau Dance, Mundane God, Mythological God, Ballad-Opera, Jhumor, Gambhir Singh Mura, Tradition.

Abstract

The art of West Bengal is a great example of Indian artistic skill. Artistically the art of West Bengal has aesthetic and cultural novelty. The artistic heritage of West Bengal is very rich in music, dance, painting, mask work, architecture, sculpture etc. The use of mask is seen in the folk dance of West Bengal. Masks are made in Baghmundi-Charida village of Purulia district. Chhau mask is born in this village. This colourful mask is used for chhau a famous folk dance of Purulia district. This colourful marks are used in chhau dance to portray mythological characters and as a part of folk culture. Chhau of Purulia has got the Geographical Indication (GI) tags which deserve a lot of praise and tradition.

The preparation of war as the excitement of victory task an aesthetic form through dance. Actually the chhau dance was the achievement of pursuit by demonstrating physical skill. The 'Ulfa' indicates that the dance is performed with various colours on face. Buy 1953 porters from Burdwan came to build Radha Govind temple and idols of the invitation of Samnta king. Coloured masks where ereated under the influence of this artist. From the 'Kathak Thakur' and Brahmin, 'Sutradhar' of Charida village of Purulia Baghmundi area got an elder idea about the various variation of faces of various mythological characters. At first the face is made with raw soil or clay soil. Then it is coated with ash, then with the paper layers is given on the other. Then they are dried in the sunlight and covered with a thin layer of clay. In this way the folds of the eyes, mouth and limbs become evident. After that soaked cotton cloth is wrapped around the soil. After when it is dried, the face open with a light pressure, then the mask is rubbed with a 'markin' cloth and smoothed it. Then it is painted. After that the decoration of the Mask is completed with 'lace', 'rangta', 'chumki', 'punti', 'plastic flowers', 'peacock feather', 'small plastic ball' of different colours etc. Mainly the subject from the Ramayana, the Mahabharata and the purana has been given importance. No mundane subject or character was given importance in the early Mask making of this region but with the progress of time mundane character gain importance and they were masked.

Chhau dances performed wearing these masks. Marks and chhau dance are inextricably linked. At the beginning of the each scene of the chhau dance the entire stray or subject is explained to the present spectators through Jhumor songs. As the chhau dance reveals the expression of the face, the artist express the character's ecpression through the resonance of the limbs contraction, expansion and 'Ulfa'. Thus the use of masks in chhau dance of purulia has given a different dimension to chhau dance. In short, chhau dance and mask art play an important role as a part of the folk art of Purulia.

Discussion

আমাদের জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা মিলেমিশে থাকে। এই জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম থেকেই বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির ভিত্তি তৈরি হয়। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার মুখোশ শিল্প ও ছৌ নৃত্য অন্যতম একটি ধারা। এই লোকসংস্কৃতির তথ্য, ইতিহাস বাংলার লোকশিল্পের মুকুটে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প অঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়েছে। মুখোশের রূপবৈচিত্র্য বিশ্ব জুড়ে। আঁকার, রঙিন সজ্জা ও নানা উপাদানের মাধ্যমে তৈরি মুখোশ শুধুমাত্র একটি আকর্ষণীয় বস্তু নয়— ছদ্ম-চরিত্রের প্রদর্শনে এর আবেদন যথেষ্ট। এই ছদ্মরূপ মুখোশের রূপবৈচিত্র্য যেমন রয়েছে তেমনি এর ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যও অনন্য। মুখোশ বাহ্যিক ভাবে রূপান্তরিত চরিত্রকেই প্রকাশ করে। আদিবাসী সংস্কৃতি, গ্রামীণ জনসমাজ এমনকি শহরের আবহেও মুখোশ তৈরি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের নানা ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে পুরুলিয়া জেলার মুখোশ ও চরিত্র ছৌ নৃত্যকে অভিনব লোকসাংস্কৃতিক উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহন সিংহ দেবের সময় থেকে (প্রায় ১৫০ বছর আগে) ছৌ মুখোশ বানানোর ঐতিহ্য চলে আসছে। তিনি ছিলেন এই লোকশিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ছৌ মুখোশ ঐতিহ্যগতভাবে তৎকালীন মানভূমের প্রাচীন নৃত্যশৈলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত - যা সময়ের সাথে অবলুপ্ত হলেও মুখোশ তৈরির শিল্প ও ছৌ নাচ আজও অবিচল রয়েছে। ছৌ-মুখোশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলার একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। পুরুলিয়াতে প্রচলিত ছৌ এবং ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের ছৌ-এর মূল পার্থক্য হল মুখোশ ও পোষাকাদির ব্যবহারে। আবার ঝাড়খণ্ডের সরাইকেল্লার ছৌ-তে মুখোশ থাকলেও অলঙ্করণ করা ও নির্দিষ্ট বস্ত্রের ব্যবহার নেই। যেহেতু পুরুলিয়ার ছৌ-এর ক্ষেত্রে মুখোশের ব্যবহার আছে তাই এক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি মুখের পরিবর্তে হাত ও দেহের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ ভারতের ভৌগোলিক স্বীকৃতির তালিকাতে নিবন্ধিত। অনন্য দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনা ও ছৌ মুখোশ তৈরির ঐতিহ্যের জন্য এটি বিশ্বে সমাদৃত। পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডি-চড়িদা গ্রামের ছৌ নাচের ক্ষেত্রে ছৌ মুখোশ ব্যবহৃত হয়। এটি পশ্চিমবঙ্গের একটি লোকশিল্প কলা। এছাড়াও পুরুলিয়া, ঝালদা, রঘুনাথপুর ও তৎসংলগ্ন গ্রামাঞ্চলেও মুখোশের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কাদামাটি, নরম কাগজ, লঘুকৃত আঠা, সুতির পাতলা কাপড়, সূক্ষ্ম ভস্মচূর্ণ, রং প্রভৃতি মুখোশ তৈরির প্রধান উপকরণ। পুরুলিয়ার ছৌ নাচে ব্যবহৃত ছৌ মুখোশগুলি প্রধানত পৌরাণিক চরিত্রের ওপর যেমন— মহিষাসুরমর্দিনী, রাম-সীতা, রাম-রাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে সাঁওতাল দম্পতির মুখোশ রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মূল মুখোশের চারপাশে দু-ফুট পর্যন্ত গয়না ও কাপড় দিয়ে বিভিন্নভাবে অলঙ্করণ করা হয়। দুর্গা, লক্ষ্মী, কার্তিক-এর মুখোশগুলি গাঢ় হলুদ বা কমলা রং করা হয়। শিব, সরস্বতী ও গণেশ-এর মুখোশগুলি সাদা রং করা হয়। আবার মা কালীর মুখোশটিতে কপালে তিলক কাটা থাকে। অসুরের মুখোশের ক্ষেত্রে সাধারণত গোঁফ, দৃশ্যমান দন্তপাটি ও বিস্ফারিত চোখসহ কালো বা গাঢ় সবুজ রঙ করা হয়।

ছৌ মুখোশ প্রস্তুতকারকেরা হলেন সূত্রধর সম্প্রদায়ের লোক। মুখোশ প্রস্তুতি একাধিক ধারাবাহিক পদ্ধতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। চড়িদা গ্রামের প্রায় ১০০টি পরিবার মুখোশ শিল্পের ছোট দোকান সাজিয়ে রোজ বসেন। প্রায় ৩০০ মানুষ এই শিল্পকে জীবিকা রূপে বেছে নিয়েছেন। এই শিল্পের মান অপূর্ব। এদের পুরাণ এবং পৌরাণিক চরিত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান সত্যিই প্রশংসনীয়। এবার মুখোশ তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল —

মুখোশ তৈরির জন্য প্রথমে নদীর দোঁয়াশ মাটি দিয়ে একটি কাঠের ওপর ছাঁচ তৈরি পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর ছাঁচের নাক, মুখ, চোখ তৈরি করা হয়। একটা কাপড়ের মধ্যে ছাই রেখে সেই কাপড়ের মধ্যে একটা ফুটো করে মুখোশের ওপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে ছাইয়ের একটা আস্তরণ তৈরি করা হয়। এর ফলে পরে ছাঁচ থেকে মুখোশকে পৃথক করা সহজ হয়। এরপর জলে ময়দা ও তুঁত মিশিয়ে আঠা তৈরি করে মুখোশের ছাঁচে তিন থেকে চার স্তর কাগজ জড়িয়ে দেওয়া হয়। একদিন পরে কাগজের স্তর গুলি শুকিয়ে গেলে আট থেকে দশটি স্তর কাগজ জড়ানো হয় থাকে এঁটেল মাটি জল দিয়ে ঘোলা করে আট-দশ দিন রেখে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিটিকে কাবিজ বলা হয়। এরপর আট থেকে দশটি স্তরে সুতির পাতলা কাপড় কাবিজের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখা হয়। মুখোশের নাক, মুখ, চোখ, শন পালিশ করে রৌদ্রে রাখা হয় ও দুইদিন পরে মুখোশের অবয়ব এবং মাটির ছাঁচটি পৃথক করা হয়। এরপর মুখোশের মিনারার কাগজ ও কাপড় কেটে ভেতরের দিকে জুড়ে মুখোশটিকে দু-আড়াই ঘণ্টা উল্টো করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর তেঁতুলের বীজ সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে সারারাত ভিজিয়ে একটা আঠা তৈরি করে তার সাথে খড়িমাটি মিশিয়ে মুখোশের ওপর বারবার লাগিয়ে মুখোশের রং সাদা করা হয়। এরপর বিভিন্ন মূর্তিতে পৃথক পৃথক রং লাগিয়ে মুখোশের বিভিন্ন অংশ এঁকে সবশেষে চোখের মণি এঁকে রঙের কাজ সমাপ্ত করা হয়। এরপর শুরু হয় মুখোশের কাঠামো তৈরির কাজ।

প্রথমে তার দিয়ে বাইরের কাঠামো তৈরি করা হয়। এরপর পুঁতি, মালা, কানপাশা, কলকা, পালক প্রভৃতি লাগিয়ে কাঠামোর সাজসজ্জা সম্পন্ন করা হয়। মুখোশের এই সজ্জার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম আছে। যেমন— পাপুটিমলি, মতিমালা, মৌসুমী মালা, মার্বেল, ইত্যাদি। মুখোশ পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে লোহার রড গরম করে চোখের ফুটো তৈরি করা হয় এবং কানের দুটি ফুটো করে তাতে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়, যার সাহায্যে একজন ছৌ শিল্পী মুখোশটি মুখের পরে মাথার পেছনের দিকে বেঁধে নিতে পারে। এরপর মুখোশে সাবুর মিশ্রণ লাগিয়ে, রোদে শুকিয়ে বার্ণিশ লাগিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা হয়। চরিত্র অনুযায়ী মুখোশের রঙ করা হয়। দেব-দেবীদের মুখোশগুলিতে হলুদ, অসুর বা খলচরিত্রগুলিতে কালো বা গাঢ় নীল রঙ দিয়ে মুখোশ তৈরি করা হয়। তাদের মুখোশে থাকে ভয়ানক চোখের চাহনি, দাঁড়ি ও গোঁফ। মুখোশ তৈরির শেষ পর্যায়ে এসে শোলা, পালক, জরি ও রাংতা দিয়ে মুখোশটিকে সাজিয়ে তোলা হয়। অনেকক্ষেত্রে ড্রিল মেশিন দিয়ে চোখ ও নাকের ছিদ্র করা হয়, যাতে ছৌ নৃত্যের শিল্পীদের নাচের সময় কোনোভাবে দেখার বা নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সুবিধার জন্যই এই ছিদ্র করা হয়। গম্ভীর সিং মুড়া ছৌ নৃত্যের একজন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী। মুখোশ শিল্পী নেপাল সূত্রধরের নামও (মুখোশের জন্য) দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বাঘমুণ্ডি থানার এই চড়িদা গ্রামের মুখোশ শিল্পীদের কাজ দেশ-বিদেশে বন্দিত হয়েছে। বিশ্বায়নের খেয়ায় ভর দিয়ে এই মুখোশ শিল্পের প্রচার আরও সুদূরপ্রসারী হচ্ছে। ছৌ নৃত্যের প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে শিল্পীরা তাঁদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন।

প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে ঝুমুর গানের মাধ্যমে পালার সমস্তটা উপস্থিত দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ছৌ নাচে মুখে মুখোশ থাকার ফলে মুখের অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয় না বলে শিল্পীরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন, সংকোচন-প্রসারণ ও উলফা দেওয়ার মধ্য দিয়ে চরিত্রের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন।

ছৌ নৃত্যশিল্পীরা যে মুখোশ পরে নাচ করেন সেগুলি খুব বিশদে ও খুঁটিনাটি ভাবে তৈরি করা হয়। এই মুখোশগুলি ছাড়াও তারা যে পোশাকগুলি পরেন সেগুলি বর্ণময় ও অলংকৃত করা থাকে পোশাকে রাংতা, জরি এবং পুঁতির কাজ থাকে, বিভিন্ন বাংলা, হিন্দি, তামিল প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও এই মুখোশ বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে (যেমন— 'বরফি' সিনেমা)। বিভিন্ন পুজো প্যাণ্ডেল, ঘর সাজানোর কাজে মুখোশ ব্যবহৃত হয়েছে। এই মুখোশ শিল্পের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

প্রবাদ প্রতিম ছৌ শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার (পদ্মশ্রী প্রাপ্ত) হাত ধরেই বাংলার ছৌ নাচ ও মুখোশ শিল্প বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছে। বাঘমুণ্ডির রাজ পরিবারের দুর্গাপুজোর প্রতিমা গড়তে এসেছিলেন বর্ধমানের সূত্রধরেরা। তাদের মাধ্যমেই মুখোশের প্রচলন শুরু হয় প্রায় দেড়শো বছর আগে। তারপর ক্রমশ এই শিল্পের বৃদ্ধি হয়, খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দেশীয় পর্যটকদের পাশাপাশি বহু বিদেশি পর্যটক ও গবেষকরা এই গ্রামে গবেষণামূলক কাজে আসেন। চড়িদা গ্রামের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য ইউনেস্কো ও প্রশাসন (কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার) একাধিক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 287
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উদ্যোগ নিয়েছেন। জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডেক্স (জি-আই) ট্যাগ পেয়েছে চড়িদা গ্রামের ছৌ মুখোশ শিল্প। শিল্পীদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সংগঠন। সরকারি উদ্যোগে গ্রামেই অনুষ্ঠিত হয় মুখোশ শিল্পমেলা। চড়িদার মুখোশ শিল্পীরাই এই শিল্পমেলা আয়োজন করেন। এই মুখোশ শিল্পীরাই বাংলা ও দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য শিল্পমেলায় নিজেদের শিল্পকর্মের পসরা সাজিয়ে বর্তমানে হাজির হচ্ছেন। এই গ্রামেই গড়ে উঠেছে রিসোর্স সেন্টার। চড়িদা ও বাঘমুণ্ডি গ্রামে মুখোশ সংক্রান্ত নানা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আর এখানেই রয়েছে ছৌ মুখোশের ওপর বিশেষ কমিউনিটি মিউজিয়াম। চড়িদা গ্রামের মুখোশ শিল্প ক্রমাগত খ্যাতি লাভ করেই চলেছে।

ছৌ নৃত্য :

বর্তমানে ছৌ-নৃত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে চর্চিত। ছৌ-নৃত্য পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকনৃত্য। এই শিল্পের বিস্তৃতি পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডি-চড়িদা গ্রামেই সীমাবদ্ধ নেই, এই শিল্প বর্তমানে যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এই ছৌ-নৃত্য বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতেও মর্যাদা পেয়েছে। আজ পুরুলিয়া জেলার পরিচয় হিসেবে ছৌ-নৃত্যকেই প্রথমে তুলে ধরা হয়। ছৌ-নৃত্য ও পুরুলিয়া যেন একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই দুয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ছৌ-নৃত্য পুরুলিয়া জেলাকে শিল্পকলা ও সংস্কৃতির দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। এই ছৌ-নৃত্য পুরুলিয়া জেলার এক অমূল্য সম্পদ। বর্তমানে ছৌ-নৃত্য বিদেশের মাটিতে সমাদর লাভ করেছে। সমগ্র পুরুলিয়া জেলা ও এই জেলার সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যার কিছু কিছু স্থানে এই ছৌ-নৃত্যের চর্চা করা হয়। পুরুলিয়ার এই নৃত্যের বিষয়বস্তুতে পৌরাণিক কাহিনির প্রভাব থাকলেও এটি মূলত লোকনৃত্য। এই লোকনৃত্যের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, সঙ্গীত, পোষাক প্রভৃতি প্রতিটি উপাদানই লৌকিক উপাদানের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়। লোকশিক্ষার প্রচার, সচেতনতা ও চিত্ত বিনোদন এই নৃত্যের মূল উদ্দেশ্যে।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ছৌ নৃত্য সর্বমোট তিনটি ধারায় প্রদর্শন করা হয়। যথা— ১. পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য (পশ্চিমবঙ্গ), ২. সরাইকেল্লার ছৌ-নৃত্য (ঝাড়খণ্ড), ৩. ময়ূরভঞ্জ-এর ছৌ-নৃত্য (উড়িষ্যা)। আমার আলোচ্য এই পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যকে আমরা চারটি ঘরানায় বিভক্ত করতে পারি। এগুলি হল—ক. বাগমুণ্ডি-চড়িদা ঘরানার ছৌ-নৃত্য, খ. বান্দোয়ান ঘরানার ছৌ-নৃত্য, গ. ঝালদা ঘরানার ছৌ-নৃত্য, ঘ. আড়ষা ঘরানার ছৌ-নৃত্য। আপাতদৃষ্টিতে এই চারটি ঘরানার ছৌ-নৃত্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষ করা না গেলেও এই চার ঘরানার ছৌ-নৃত্যের মধ্যে নৃত্যের মূলগত ধারা ও আঙ্গিকগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েই গেছে। পুরুলিয়া জেলার মধ্যে বাগমুণ্ডি, চড়িদা, সিন্দরী, তোড়াং, বাড়েডি, পাতরডি, গোবিন্দপুর, কুশলডি, সারিডি, কালিমাটি, বুড়দা, কড়েং, রেরেংটাঁড, ঘাঁটিয়ালি (অযোধ্যা পাহাড়ের একটি গ্রাম), অযোধ্যা (অযোধ্যা পাহাড়ের একটি গ্রাম), বীরগ্রাম, জয়পুর, বরাবাজার, ঝালদা, আড়ষা, বান্দোয়ান, বোঙাবাড়ি (পুরুলিয়া শহরের অন্তর্গত)— এই সমস্ত স্থানে ছৌ-নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন আছে। বাগমুণ্ডি থানার মধ্যে মোট ১৪টি ছৌ-নাচের দল আছে। এই ছৌ-নাচের দল পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও দিল্লি, রাউরকেল্লা, উড়িষ্যা, গুজরাত, নেপাল, ভুটান, কেরল, আন্দামান, বাংলাদেশ গেছে। এছাড়া ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের অন্তর্গত চাণ্ডিল ও কুশপুতুল এলাকাতেও ছৌ-নৃত্যের প্রচলন আছে। এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র পুরুষেরাই এই নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সম্প্রতি মহিলারাও এই নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। পুরুলিয়া শহরের অন্তর্গত বোঙাবাড়ি এলাকার 'মহিলা ছৌ-নৃত্য দল'-টিও প্রশংসার দাবি রাখে।

চড়িদা গ্রামের বাসিন্দা গম্ভীর সিং মুড়া এই ছৌ নৃত্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। এই গম্ভীর সিং বাবুর সঙ্গে অনিল সূত্রধরও এই ছৌ-নৃত্য করতেন। অনিল সূত্রধর ছৌ-নৃত্যের পাশাপাশি পরবর্তীতে মুখোশ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গম্ভীর সিং মুড়া তাঁর ছৌ-নৃত্যের কুশলতার জন্য ভারত সরকার দ্বারা পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়াও তিনি পরবর্তীকালে সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার পান। পুরুলিয়া জেলার এই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব গম্ভীর সিং মুড়া ছৌ-নৃত্যকে লণ্ডন, প্যারিস, লস এঞ্জেলেস, টোকিও, ওয়াশিংটন-এর মতো বিদেশের মাটিতে পরিবেশন করেছেন। যা আমাদের লোকশিক্ষার মুকুটে এক সম্মানের পালক যুক্ত করেছে। গম্ভীর সিং মুড়া ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের মানভূম জেলার অন্তর্গত অযোধ্যা পাহাড়ের নিকট পিটিদারি নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জিপা সিং মুড়া। জিপা সিং মুড়াও ছৌ-নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই গ্রামে তিনি মাত্র চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বসবাস করেন তারপর তিনি ১৯৪৩ সালে চড়িদা গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। অল্প বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হওয়ার জন্য তিনি সংসারের যাবতীয়

কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। চড়িদা গ্রামের কাছাকাছি যে সমস্ত জঙ্গল এলাকা রয়েছে সেখানে তিনি গরু চরাতে যেতেন। এই গরু চরাতে চরাতেই বনের প্রকৃতির অনুষঙ্গ থেকে ঝুমুরের তালিম নেন। ১৯৫৮ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস চলাকালীন রাষ্ট্রপতি ভবনে পূর্ব ভারতের লোকনৃত্যের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের দল 'মহিষাসুর-বধ পালা' করে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই পালাতে গম্ভীর সিং মুড়া মহিষাসুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর নাচের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেছিলেন—

> "নিজেই সাজ করলাম। মুখোশ বাঁধলাম। আমি মহিষাসুর, ক্ষীরোদ গণেশ, অনিল দুর্গা আর ভুকি কার্তিক। ক্ষীরোদ মঞ্চে ঢুকে দু-চার পাক নাচামাত্র দর্শকেরা শান্ত। তারপর আমি প্রায় ভুঁইমেশা হয়ে স্টেজে ঢুকে একটু বুক তুলে গণেশের দিকে তাকিয়েছি। তারপর পাশে রাখা ঢাল তর‍্যাল নিয়ে দৌড়ে নিয়ে সামনে পিছনে কয়েকটা ভল্ট দিলাম। চড়চড় করে হাততালি পড়ল, আর থামতে চায় না। তারপর আর জানি নাই কোথায় বারিপদা, কোথায় মণিপুর। দুর্গা, গণেশ, কার্তিকের সঙ্গে যুদ্ধে মাতাই গেলি। একসময় শুনলাম, বলছে পুরুলিয়ার ছৌ ফার্স্ট।"[১]

ছৌ-নাচ বা ছো-নাচ বা ছ-নাচ হল একপ্রকার ভারতীয় আদিবাসী যুদ্ধ নৃত্য। এই নাচ ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যায় জনপ্রিয়। ছৌ-নাচের আদি উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা। উৎপত্তি ও বিকাশের স্থল অনুযায়ী ছৌ-নাচের তিনটি উপবর্গ রয়েছে। যথা— পুরুলিয়ার ছৌ, সরাইকেল্লার ছৌ ও ময়ূরভঞ্জের ছৌ। পুরুলিয়া ও সরাইকেল্লাতে মুখোশের ব্যবহার হয় ছৌ-নাচের নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের মতামত রয়েছে। ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাত ও ড. সুধীর করণের মতে, এই নাচের নাম ছো, আবার বিভূতি দাশগুপ্ত ও ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত-এর মতে, এই নাচের নাম হল ছ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র সাহিত্যের অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম ছ বা ছো নাচের পরিবর্তে ছৌ নামকরণ করেন। বিদেশে এই নাচের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার পরে এই নাচ ছৌ-নাচ নামেই জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। রাজেশ্বর মিত্রের মতে, তিব্বতী সংস্কৃতির ছাম নৃত্য থেকে ছৌ-নাচের উদ্ভব হয়েছে। ড. সুকুমার সেনের মতে, শৌভিক বা মুখোশ থেকে নাচটির নামকরণ হয়েছে ছৌ। কুড়মী সম্প্রদায়ের ভাষা কুড়মালী ভাষার ছুয়া বা ছেলে থেকে এই নাচের নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কারণ ছৌ প্রধানত ছেলেদের নাচ ছিল। ড. সুধীর করণের মতে, ছু-অ শব্দের অর্থ হল ছলনা ও সং। কোনো কোনো আধুনিক গবেষক মনে করেন, ছৌ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ছায়া থেকে। কিন্তু সীতাকান্ত মহাপাত্র মনে করেন, এই ছাউনি শব্দটি থেকে এসেছে।

ছাউনি শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবশ্য সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি বা সেনানিবাস। কারণ ছৌ-নাচের বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন যুগে সৈন্যরা যুদ্ধের সময় এরকম মুখোশের আশ্রয় নিতেন, কেউ আবার বলেন, তিব্বতের 'ছামনৃত্য' থেকে এর উৎপত্তি। এই ছামনৃত্যও একধরনের মুখোশ নৃত্য। ছৌ-নৃত্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ হল মুখোশ। তবে পুরুলিয়ার ও সরাইকেল্লার ছৌ-তে মুখোশের ব্যবহার করা হলেও ময়ূরভঞ্জের ছৌ নাচে মুখোশের প্রচলন নেই। ছৌ নাচের আরেকটি প্রধান অনুষঙ্গ হল নানা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। গান-বাজনার সহযোগে এই লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়। নাচের শুরুতে গণেশ বন্দনার মধ্য দিয়ে বাজনদারেরা নাচের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। ঢোল, মাহরি, চড়চড়ি, ধামসা প্রভৃতি ছৌ-নাচের চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্র। বর্তমানে নানা আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার— সালট, পাখোয়াজ, কাঁশি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি।

পুরুলিয়ার ছৌ-নাচে বর্ণময় মুখোশের ব্যবহার লক্ষণীয়। এই কারুকার্যময় মুখোশ তৈরি করতে অনেকদিন সময় লাগে। হাতের কাছে পাওয়া জিনিসপত্র দিয়েই তৈরি করা হয় ছৌ-নাচের মুখোশ। কাগজের মণ্ড দিয়ে ছাঁচ ঢেলে মুখের আদল দেওয়া হয়। তারপর মুকুট, চুমকি, কাপড়ের লেস বসিয়ে সেটাতে অলঙ্করণ করা হয়। ছৌ-নাচে শিল্পীরা হাত-পা-বুক-কোমর প্রভৃতি শরীরের অন্যান্য অংশগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। রঙ-চঙে পোষাক পরে আর মুখোশ পরে ছৌ-শিল্পীরা যখন খোলা মাঠে নৃত্য পরিবেশন করেন তখন সেই দৃশ্য অতি মনোরম লাগে। নিপুণ দক্ষতায় ছৌ-শিল্পীরা তাদের নাচের মাধ্যমে বীররস ফুটিয়ে তোলেন। প্রাচীন যে বিশ্বাস থেকে অর্থাৎ অশুভ শক্তিকে পরাজিত করবার জন্যে মানুষ একদিন নৃত্যের আয়োজন করেছিল, সেই বিশ্বাস আজও ছৌ-নাচের মধ্যে ধরা পড়ে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই ঐতিহ্যবাহী ছৌ-নাচে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। চিরাচরিত পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে সমসাময়িক নানা ঘটনা ও দৈনন্দিন জীবনের নানা দিকও প্রাধান্য পাচ্ছে ছৌ-নাচের পালায়। শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্যের এক অপার বন্ধনে গড়ে উঠেছে

এই অনন্য নৃত্যশৈলী, যা সময়ের সাথে সাথে হয়েছে আধুনিক এবং অভিনবত্বে মোড়া। আর তাই এই লোকনৃত্য দেশে-বিদেশে আজও সমাদৃত। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে এক সুতোয় গেঁথেছে এই ছৌ-নাচ।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় প্রচলিত ছৌ-নাচের ধারাটি পুরুলিয়ার ছৌ নামে পরিচিত। এই ধারায় স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুলিয়া ছৌ-এর সৌন্দর্য ও পারিপাট্য এটিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে নতুন দিল্লীতে আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ট্যাবলোর থিমই ছিল ছৌ-নাচ। ছৌ মূলত উৎসব নৃত্য। পুরুলিয়ারর ছৌ-নাচে বান্দোয়ান ও বাগমুণ্ডির দুটি পৃথক ধারা লক্ষ করা যায়। বান্দোয়ানের নাচে পালাগুলির ভাব গম্ভীর এবং বাগমুণ্ডির নাচে পালাগুলির ভাব বীরত্বব্যঞ্জক। পুরুলিয়া জেলায় ছৌ-নাচের মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুড়মী ও ভূমিজ মুণ্ডারা। পরে এই নাচে কুমার, মাহাত, রাজোয়াড় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা নর্তক হিসেবে ও ডোম সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাদক শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯১১ সালে কুপল্যাণ্ডের ডিস্ট্রিক গ্যাজেটিয়ার মানভূম গ্রন্থে ছৌ-নাচের কোনো উল্লেখ না থাকায় অনেকে মনে করেন ১৯১১-এর পরে ছৌ-নাচের উদ্ভব হয়েছে। মানভূম গবেষক দিলীপকুমার গোস্বামীর মতে, শিবের গাজনের মুখে কালি মেখে বা মুখোশ পরে ছৌ-নাচের আদি রূপ বলে মনে করেছেন। এরপর অনাড়ম্বর মুখোশ সহকারে একক ছৌ বা 'এ কৈড়া ছৌ' নাচের উদ্ভব হয়। যেখানে মুখোশ ছাড়া দুইজন বা চারজন নর্তক নাচ করতেন। এছাড়া সম্ভ্রান্ত বাড়ির নর্তকরা রাজকীয় পোষাক পরে একপ্রকার নাচের প্রচলন করেন। এই নাচের ধুয়া নামক ছোট ঝুমুর গান গাওয়া হয়ে থাকে। ১৯৩০-এর দশকে 'পালা ছৌ' নাচের সৃষ্টি হয়। ছৌ-শিল্পীরা সারা চৈত্র মাস ধরে অনুশীলন করে থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে সারা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের রোহিনী উৎসব পর্যন্ত ছৌ-নাচের প্রদর্শন করা হয় পুরুলিয়া জেলার শিবের গাজন উপলক্ষ্যে ছৌ-নাচের আসর বসে।

ছৌ-নাচ বিষয়গতভাবে মহাকাব্যিক। এই নাচে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান অভিনয় করে দেখানো হয়। কখনও কখনও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনিও অভিনীত হয়। ছৌ-নাচের মূল রস হল বীর ও রুদ্র। নাচের শেষে দুষ্টের দমন ও ধর্মের জয় দেখানো হয়। গ্রামাঞ্চলে এই নাচের আসর কোনো মঞ্চে হয় না, খোলা মাঠেই আসর বসে। দর্শকেরা চারপাশে জড়ো হয়ে বসে নাচ দেখে। তবে শহরাঞ্চলে সাধারণত মঞ্চেই ছৌ-নাচ দেখানো হয়। নাচের শুরু হয় ঢাকের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে। এরপর একজন গায়ক গণেশের বন্দনা করেন। গান শেষ হলে বাদ্যকারেরা বাজনা বাজাতে বাজাতে নাচের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। প্রথমে গণেশের বেশধারী নর্তক নাচ শুরু করেন। তারপর অন্যান্য দেবতা, অসুর, পশু ও পাখির বেশধারী নর্তকেরা নাচের আসরে প্রবেশ করে নাচ শুরু করেন। প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে ঝুমুর গানের মাধ্যমে পালার বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেন।

ছৌ-নাচে মুখে মুখোশ থাকার ফলে মুখের অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয় না বলে শিল্পী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন ও সঙ্কোচন প্রসারণের মধ্য দিয়ে সেই চরিত্রটির অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ছৌ-নাচের অঙ্গ সঞ্চালনকে মস্তক সঞ্চালন, স্কন্ধ সঞ্চালন, বক্ষ সঞ্চালন, উল্লম্ফন এবং পদক্ষেপ— এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। বাজনার তালে হাত ও পায়ের সঞ্চালনকে চাল বলা হয়ে থাকে। ছৌ-নাচে দেবচাল, বীরচাল, রাক্ষসচাল, পশুচাল প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের চাল রয়েছে। চালগুলি ডেগা, ফন্দি, উড়ামালট, উলফা, বাঁহি মলকা, মাটি দলখ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি থানার অন্তর্গত চড়িদা গ্রামের প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার এবং জয়পুর থানার ডুমুরডি গ্রামের পাঁচটি পরিবার ছৌ-নাচের মুখোশ তৈরি করেন। এছাড়া পুরুলিয়া মফস্বল থানার গেঙ্গাড়া, ডিমডিহা ও কালীদাসডিহি গ্রামে, পুঞ্চা থানার জামবাদ গ্রামে এবং কেন্দা থানার কোনাপাড়া গ্রামেও এই মুখোশ তৈরি হয়।

ছৌ-নাচ বা ছো-নাচ বা ছ-নাচ এক জনপ্রিয় লোকনৃত্য। ছৌ-নাচ বহু প্রাচীন এক লোকনৃত্য। এই ধরনের লোকনৃত্য সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। এই নাচের মধ্যে আদিম সমাজের নানা চিহ্ন লক্ষ করা যায়। আদিম যুগের শিকার ছিল মানুষের জীবনযাত্রার অন্যতম অঙ্গ। প্রাচীনকালের মানুষের দুর্গম বনে-জঙ্গলে গিয়ে শিকার করাই ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। তাই শিকারে যাওয়ার পূর্বে নিজেদের উদ্দীপ্ত করার জন্য তারা নাচানাচি করত। বিভিন্ন পশুপাখির নানা অঙ্গভঙ্গি নাচের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতো, যা একসময় ছৌ-নাচের অন্যতম

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 287
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিষয়বস্তু ছিল। ছৌ-নাচের আসল রূপ প্রকাশ পায় খোলা মাঠে। তবে আজকাল মঞ্চেও ছৌ-নাচের আয়োজন করা হয়ে থাকে। যে সব শিল্পী ছৌ-নাচ পরিবেশন করেন, তারা সকলেই কিন্তু পুরুষ। পুরুষ শিল্পীরাই মহিলার বেশ ধারণ করেন। তবে বর্তমানে ছৌ-নাচের প্রদর্শনীতে মহিলারাও অংশ নিচ্ছেন। পুরুলিয়ার প্রবাদ প্রতিম একজন ছৌ-শিল্পী ছিলেন গম্ভীর সিং মুড়া। তিনি ছৌ-নাচকে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে মানুষ যখন কৃষিনির্ভর অর্থনীতির মধ্যে প্রবেশ করল, তখন ভালো ফসলের কামনায় প্রকৃতি দেবীর কাছে নৃত্যের মধ্য দিয়ে বৃষ্টি আনার প্রার্থনা করত। তারপর মনে করতেন, নাচের মাধ্যমে তারা বৃষ্টি আনতে পারবেন এবং তার ফলে এই পৃথিবী হয়ে উঠবে শস্যশ্যামলা। সাধারণত চৈত্র পরব বা শিবের গাজন উপলক্ষ্যে ছৌ-নাচের অনুষ্ঠান হয়। রুক্ষ, শুষ্ক, অনুর্বর প্রান্তরে বৃষ্টি আনার জন্য চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ছৌ-নাচের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ডের সরাইকেল্লা কিংবা উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের মতো জায়গা রুক্ষ, শুকনো অঞ্চল হিসেবেই পরিচিত। অনাবৃষ্টি বা খরা এসব অঞ্চলের একটি বড় সমস্যা। ফলে সেখানে চাষবাসকে জীবিকা হিসেবে যারা বেছে নিয়েছেন, তাদের কাছে অনাবৃষ্টি মানেই অভিশাপ। আর তাই তারা ছৌ-নাচের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির দেবীকে সন্তুষ্ট করতে চায়, যেন তাদের উপর রুক্ষ ভূমিতে প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হয় এবং ভূমিগুলো শস্যে ভরে ওঠে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই ঐতিহ্যবাহী ছৌ-নাচে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। চিরাচরিত পৌরাণিকতার সঙ্গে সমসাময়িক নানা ঘটনা ও দৈনন্দিন জীবনের নানা দিকও প্রাধান্য পাচ্ছে ছৌ-নাচের পালায়।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন আনুষ্ঠানিকভাবে ছৌ-নাচ শুরু হত। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখ পর্যন্ত এই নাচ হত। বর্তমানে এই নাচের চাহিদা তুঙ্গে থাকায় সারা বছরই এই নাচ প্রদর্শিত হচ্ছে। মূলত ধর্মীয় কাহিনি এবং ধর্মীয় আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে এ নাচ চলে। কিন্তু বর্তমানে ধর্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে ছৌ-নৃত্যের কাহিনিতে উঠে এসেছে সামাজিক পালা ও রাজনৈতিক পালাও। যার ফলে দর্শকদের এগুলি হয়ে উঠেছে আরও বেশি আকর্ষণীয়। ছৌ-নাচের সৃষ্টি হয়েছে ১৯১১ সালের পরবর্তী সময়ে। সব জাতি সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে এই নাচটিকে একটি সাম্প্রতিক রূপ দিয়েছেন। ছৌ-নৃত্যের একটি বিবর্তন লক্ষ করা গেছে। বর্তমানে ছৌ-নৃত্য মুখোশ নৃত্যে পরিবেশিত হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে মুখোশের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। নৃত্যকারীরা রংবেরঙের সেঁজে নৃত্য প্রদর্শন করত। দিলীপ কুমার গোস্বামীর মতে, মুখে কালি মেখে মুখোশ পরা নাচকেই ছৌ-নৃত্যের আদি রূপ বলে মনে করেছেন। এরপর এল একক ছৌ-নৃত্য। মুখোশ ছাড়া এই নৃত্যের নাচ হত। আলাপ ছৌ-নৃত্যের পর এক বাবু ছৌ-নৃত্য। এতে সম্ভ্রান্ত বাড়ির নর্তকরা আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-পোষাক পরে নাচতেন। এর পরবর্তীকালে পালা ছৌ-নাচের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমানে মুখোশ বাদ দিয়ে ছৌ-নাচের অনুষ্ঠান হয় না বললেই চলে।

ছৌ-নাচ ও যাত্রাপালার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আগে ছৌ-শিল্পীরা অধিকাংশই যাত্রার পোষাক পরে নাচতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই পোষাকের কিছুটা পরিবর্তন করে ছৌ-এর পোষাক তৈরি করে। যাত্রার মতই সমবেত যন্ত্রসংগীত বাজানোর পরে ছৌ-নৃত্য শিল্পীদের মঞ্চে আগমন ঘটে থাকে। খোলা আকাশের নিচে চতুর্দিকে দর্শককুলের মাঝে নৃত্য শুরু হয়। আগে ছৌ-নাচের মধ্যে মুখোশের ব্যবহার ছিল না। তখন রঙ মুখে দিয়ে চরিত্রটিকে সাজিয়ে তোলা হত। কিন্তু বর্তমানে মুখোশ ব্যবহারের মাধ্যমে পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে হুবহু দর্শকের সামনে প্রাণবন্ত করে তুলে ধরা হয়। এইভাবে ছৌ-নৃত্যের পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তা ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় না। অনেকেই ছৌ-নৃত্যকে লোকনাট্যের পর্যায়ভুক্ত করে থাকেন। ছৌ-নৃত্য যখন গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন এই পর্বে লোকনাট্যের অনেক বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ছৌ-নৃত্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু অনেকটা পরবর্তিত হয়েছে। তাই ছৌ-নৃত্যকে আর যাই হোক লোকনাট্য বলা চলে না। ছৈ-নৃত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে পুরাণ প্রসঙ্গ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনই আছে বাস্তব সংসারের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা।

পূর্বে রাজা-রাজড়াদের মতো পোষাক পরে যেমন মাথায় মুকুট, হাতে বাজুবন্ধ, ঘাগরা, ঘুঙুর পরে নাচ হত। মুখোশের ব্যবহার প্রথমের দিকে সেভাবে ছিল না বললেই হয়। পরবর্তী সময়ে ছৌ-নৃত্যের পোষাকেও পরিবর্তন আসে। পোষাক হিসেবে শাড়ি, ধুতি ব্যবহার করা হয়, ঘাগরার ব্যবহার এখন আর করা হয় না। মুখোশের ব্যবহার করা হয়। পূর্বের ছৌ-নাচের ভাব-ভঙ্গিমাতে গতি ছিল ধীর আর প্রতিটি ভঙ্গিমা খুব সূক্ষ্মভাবে দেখানো হত। কিন্তু এখন ছৌ-নাচের

গতি দ্রুত হয়েছে আর নাচের ভাব-ভঙ্গিমা পূর্বের মতো সূক্ষ্মভাবে দেখানো হয় না। পূর্বে ছৌ-নাচে গানের জন্য একটি আলাদা দল থাকত। বর্তমানে আলাদা ভাবে কোনো দল থাকে না। যারা ছৌ-নাচ করে তারাই কয়েকজন (২-৩ জন) গান গায় । ছৌ-নাচের দলের ছেলেরাই বাদ্যযন্ত্রগুলো (সানাই, পাখোয়াজ, বাঁশি, মৃদঙ্গম, সাইনা) বাজায়। এই নাচে ছয়টি জিনিস ব্যবহৃত হয়ে থাকে—ঢোল, ধামসা, সানাই, ঘুঙুর, পোষাক ও মুখোশ। নাচ পরিবেশনে ছয়টি পথ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—মড়প বেড়ানো, আসর বাঁধার উড়ান, বাজনা, নন্দনা, মেলা নাচ, পালা নাচ ও ওস্তাদি নাচ। এই ছৌ-নাচে ঝুমুর গান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত ভোলানাথ মাহাত, সুনীতা মাহাত, অঞ্জনা মাহাত-র ঝুমুর গান গাওয়া হয়। ছৌ-নাচে একজন ভাষ্যকার থাকেন, যিনি পৌরাণিক কাহিনিটিকে নাচের পূর্বে উপস্থিত দর্শকদের বুঝিয়ে দেন। ছৌ নাচের এক-একটি দলে স্থানীয় অঞ্চলে নৃত্য প্রদর্শনীর জন্য ৩০-৩৫ জন থাকে আর কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে নৃত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ১৫ জন থাকে। এই নাচেও কবিগানের মতো পক্ষে-বিপক্ষে দুটি দল থাকে। এই দুটি দল যে সবসময় একটি বিশেষ পালার ওপরেই প্রতিযোগিতা করে তা নয়। দুটি দল দুটি আলাদা পালার ওপরেও তাদের নাচের পারদর্শিতা দেখানোর চেষ্টা করে। যেমন—একটি দল 'মহিষাসুর বধ' পালার ওপর ছৌ-নাচ করলে অন্য একটি দল 'অভিমন্যু বধ' পালার ওপর ছৌ-নাচ করে। যখন কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে ছৌ-নৃত্য পরিবেশন করা হয় সেখানে একই পালার ওপরই দুটি দলকে ছৌ-নাচ করতে হয়। এক্ষেত্রে সময়সীমা থাকে ১৫-২০ মিনিট। আর স্থানীয় কোনো জায়গায় ছৌ-নাচের অনুষ্ঠান হলে সময়সীমা সাধারণত থাকে না। প্রায় ২ - ২.৩০ ঘণ্টা ধরে এক-একটা পালার ওপর ছৌ-নাচ চলতে থাকে। ছৌ-নাচ সাধারণত রাত্রের দিকেই হয়। এক রাত্রে মোট তিনটি পালা করা যায়। পক্ষে-বিপক্ষে মিলে মোট ৬টা পালা। সবথেকে বেশি হলে ৮টা পালা হয়। সেক্ষেত্রে রাত্রি পেরিয়ে সকাল হয়ে যায়। ছৌ-নাচের পালাগুলি হল—'মহিষাসুর বধ', 'অভিমন্যু বধ', 'ঘোড়াসুর বধ', 'গণেশের জন্ম', 'পরশুরামের গুরুদর্শন', 'শিবের বিবাহ', 'গণেশের বিবাহ', 'তরণীসেন বধ', 'হরধনুভঙ্গ', 'লবণাসুর বধ', 'অকালে ব্যাধের শিবপূজা', 'বিরসা মুণ্ডা' প্রভৃতি। এই পালাগুলির মধ্যে 'মহিষাসুর বধ' পালা ও 'অভিমন্যু বধ' পালার ওপর বেশি ছৌ-নৃত্য প্রদর্শন করা হয়। 'বিরসা মুণ্ডা' পালাটি সদ্য দুই বছর হয়েছে ছৌ-নৃত্য হিসেবে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই পালাটি সৃষ্টি করেছেন প্রয়াত গম্ভীর সিং মুড়ার বড় ছেলে কার্তিক সিং মুড়া।

বর্তমানে মেয়েরাও ছৌ-নাচ করে। পুঞ্চার ছৌ-শিল্পী জগন্নাথ চৌধুরী নিজের দুই মেয়ে ও আরও চারজন মেয়েকে নিয়ে একটি মহিলা ছৌ-নৃত্যের দল গঠন করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করেছেন। তাঁর মেয়ে ছৌ-শিল্পী মৌসুমী চৌধুরীর বক্তব্য,

> "সুযোগ পেলে মেয়েরাও যে ছৌ নাচতে, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি।"[২]

পুরুলিয়ায় এখন ছৌ-এর তিন থেকে চারটি মেয়েদের দল রয়েছে। মুখোশ, শাড়ি পরে দুর্গা, কালী, সরস্বতীর সাজে ছৌ-নাচের আসর জমাতেন যাঁরা, তাঁরা পুরুষ। বিশিষ্ট ছৌ-শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার জেলা পুরুলিয়ায় এ রীতি এখন ইতিহাস। পুঞ্চায় একটি মহিলা দল ছৌ-নাচের অনুষ্ঠান করে। রঘুনাথপুর ২ নং ব্লকের বি.বি গার্লস স্কুলের কন্যাশ্রীরাও ছৌ-নাচের মহড়া দেয়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এই স্কুলের কন্যাশ্রীদের ছৌ-নাচের দল ততটা দক্ষ ছিল না। তবে একথাও ঠিক যে সাধারণত মেয়েরা অন্যান্য নাচ (ক্লাসিক, কত্থক, মণিপুরী, রবীন্দ্র নৃত্য ইত্যদি) শেখার জন্য যতটা আগ্রহী ছৌ-নাচের প্রতি তাদের আগ্রহ কম। এই স্কুলের হস্টেলের আবাসিক কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য পনেরো মেয়েকে নিয়ে ছৌ-নাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। তারা 'মহিষাসুরমর্দিনী', 'কিরাত-অর্জুন', 'গণেশের দন্তভঙ্গ' পালায় তালিম নিয়েছে। আবার কিছু জায়গায় মঞ্চস্থও করেছে। লোকগবেষক সুভাষ রায়ের লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রেও মেয়েদের ছৌ-নাচের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সুভাষবাবু বলেন,

> "মেয়েদের নিয়ে ছৌ-এর দল তৈরির ইচ্ছা ছিলই। স্কুলের প্রস্তাব লুফে নিয়েছি।"[৩]

স্কুল ছুটির পরে ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ছৌ-শিল্পী শান্তিরাম মাহাত। তিনি বলেন,

> "নিয়মিত অভ্যাসে মেয়েরা দক্ষতার সঙ্গেই উলফা পরেছে। নাচের অঙ্গহানির প্রশ্নই ওঠে না।"[৪]

দুর্গার মুখোশ পরা বিউটি মাহাত, গণেশ রূপী রূপালী মাহাত, অসুরের সাজে সীমা বাউরি বলেন,

> "ছৌ নাচ ভালো লাগত। কিন্তু নিজেরাই যে ছৌ নাচব ভাবিনি।"[৫]

বি.বি গার্লস স্কুলের ছৌ-নাচের মেয়েরা কলকাতায় 'মহিষাসুরমর্দিনী' পালা করার ডাক পেয়েছিল।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 287
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। তাই লোকসংস্কৃতির ওপরও সময়ের প্রভাব পড়েছে। এই লোকসংস্কৃতির একটি অংশ লোকনৃত্য ছৌ। এই ছৌ-নৃত্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল। এই নৃত্যের ভাব-ভঙ্গিমা, প্রদর্শন, পোষাক, গান, নাচ, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতিতেও আধুনিক চিন্তাভাবনার সংযোজন হয়েছে। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে এই পরিবর্তনেরও প্রয়োজন আছে। এই ছৌ-নৃত্যের পরিধি এখন শুধুমাত্র পুরুলিয়াতেই সীমাবদ্ধ নেই, এর পরিধি সুদূর বিদেশেও বিস্তৃত হয়েছে।

বর্তমানে শুধুমাত্র পুরুষেরাই ছৌ-নৃত্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করছেন তা নয়, মহিলারাও তাদের ছৌ-নৃত্যের দল তৈরি করে, প্রশিক্ষণ নিয়ে যেভাবে মহিলা ছৌ-নৃত্য দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তা প্রশংসার দাবিদার। পুরুলিয়া জেলার মুখোশ শিল্প ও ছৌ নৃত্য এক চিরনূতন অমূল্য সম্পদ, যা লোকসংস্কৃতিতে এক উজ্জ্বল মাত্রা সংযুক্ত করেছে— একথা অস্বীকার করা যায় না।

ছৌ নৃত্যে ব্যবহৃত মুখোশ

ছৌ শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া

Reference:

১. "West Bengal Chhau", India Line Expeditions, ২৮.০২.২০১৮ তারিখের মূল আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ করা, সংগ্রহের তারিখ ১৮.১০.২০২৩

২. "ছৌ নাচে মেয়েরা, প্রসারিত হচ্ছে বৃত্ত", আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ই অক্টোবর, ২০১৮, প্রথম পৃষ্ঠা

৩. ঐ, তদেব

৪. ঐ, তদেব

৫. ঐ, তদেব

Bibliography:

মজুমদার মানস, 'লোকঐতিহ্যের দর্পণে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৩

ভট্টাচার্য আশুতোষ, 'বাংলার লোকসাহিত্য' (২য় খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা- ৭০০০১২, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩

ঘোষ দীপঙ্কর, 'বাংলার মুখোশ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

আহমেদ ওয়ালিক, 'বাংলা লোকসাহিত্য' (১ম খণ্ড), পরিমার্জিত সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৯৪

সরকার রেবতীমোহন, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা', লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৪০৮

তথ্যদাতা- দোলগোবিন্দ সিং মুড়া (পরিচালক, ছৌ-শিল্পী, ঝুমুর গায়ক ও বাদক), বয়স ৪৮ বছর, গ্রাম- বাড়েড়ি, পোস্ট- ডাভা, থানা- বাগমুণ্ডি, জেলা- পুরুলিয়া। তথ্য সংগ্রহের তারিখ- ১৮.১০.২০২৩ দুপুর ১২টা ২০ মিনিট।

সাক্ষাৎকার, তথ্যদাতা : অনিল সূত্রধর, চড়িদা, বয়স ৯৮ বছর, জানুয়ারি ১৬, ২০২৪

সাক্ষাৎকার, তথ্যদাতা : কার্তিক সিং মুড়া, চড়িদা, বয়স ৬২ বছর, জানুয়ারি ১৬, ২০২৪

সাক্ষাৎকার, তথ্যদাতা : জগদীশ সূত্রধর, চড়িদা, বয়স ৬০ বছর, জানুয়ারি ১৬, ২০২৪